চয়ন

হাসানুজ জামান শ্যামল | আসিফ আদনান | শিহাব আহমেদ তুহিন | রেহনুমা বিনতে আনিস | জুবায়ের হোসাইন | নাজমুস সাকিব | শরিফ আবু হায়াত অপু | নাবিলা নোশীন সেঁজুতি | স্বপ্নচারী আবদুল্লাহ রেজাউল কবীর | জিম তানভীর | মুহাম্মাদ রাকিবুল হাসান | ইউসুফ সুলতান সানজিদা শারমিন | হামীদা মুবাশশির আরমান বিন সুলাইমান | সাদিয়া হোসাইন | রাবেয়া রওশীন | তাবাসসুম মোসলেহ | মোদাসসির বিল্লাহ তিশাদ মাসউদ শরিফ | কবির আনোয়ার | মুহাম্মাদ সাজেদ

সম্পাদনা

আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক

শার'ঈ সম্পাদনা

ড. মোহাম্মাদ মানজুরে ইলাহী

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

চয়ন

অনুবাদ-স্বত্ব © সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড
প্রথম প্রকাশ : যুল-ক'দাহ ১৪৩৬, সেপ্টেম্বার ২০১৫
২য় সংস্করণ: জুমাদাল উলা ১৪৪৩ হিজরি, ডিসেম্বর ২০২১

ISBN: 978-984-91681-0-2

নির্ধারিত মূল্য : ২২০

অনুবাদ-স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো উপায়েই ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা বা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। বইটির অনুমোদিত অনলাইন সংস্করণ কিনুন। কপিরাইটকৃত বই বেআইনিভাবে কিনে পাইরেসিকে উৎসাহিত করবেন না। ধন্যবাদ।

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড
২য় তলা, ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।
০১৭৫ ৩৩৪৪ ৮১১ +৮৮

ইসলামে গ্রন্থস্বত্বের বিধান

গ্রন্থস্বত্ব ইসলামি শারী'আহ কর্তৃক সংরক্ষিত একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। ইসলাম প্রত্যেক লেখকের রচিত সকল রচনাকে তার ব্যক্তিগত সম্পদ বলে ঘোষণা করেছে এবং এতৎসংশ্লিষ্ট সার্বিক অধিকারও তার জন্য সংরক্ষণ করেছে। পাশাপাশি কেউ যেন গ্রন্থস্বত্ব আইন লঙ্ঘন করে তার সে অধিকার হরণ কিংবা রহিত করতে না পারে, সে নিশ্চয়তাও বিধান করেছে। ইসলামি শারী'আতের সকল দলিল-প্রমাণ ও মূলনীতি সে প্রমাণই বহন করছে।

গ্রন্থ-রচনা গ্রন্থকারের নিজেরই বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমের ফসল ও অর্জন। এ অর্জন একান্তভাবে তারই। তার অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ কোনোভাবেই তার এ সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

» কোনো মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ সে নিজে খুশিমনে প্রদান না করলে কারও জন্য কোনোভাবেই তা হালাল হবে না। [*সহীহ আল-জামি' আস-সগীর*, হাদীস : ৭৬৬২]

অতএব, গ্রন্থকারের অনুমতি ছাড়া তার রচিত গ্রন্থ থেকে আংশিক বা পূর্ণ কপি করা, ছাপানো এবং তা বেচাকেনা করা ইসলামি শারী'আতে নিষিদ্ধ ও হারাম; কেননা তা অন্যায় উপার্জন ও ভক্ষণের শামিল। আল্লাহ ﷻ বলেন—

» তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না। [সূরা বাকারা, ২:১৮৮]

অধিকন্তু এটা শারী'আতের সীমালঙ্ঘন বলে গণ্য হবে বিধায় শারী'আতের নিষিদ্ধ কাজেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ ﷻ বলেন—

» ...তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না; কেননা আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।[সূরা মায়েদা, ৫:৮৭]

সূচিপত্র

সম্পাদকের কথা ৯
নিদর্শনের সন্ধানে ১৪
নারী নারীবাদ প্যারাডাইম ২২
মানুষ তোমাকে ভালোবাসবেই ৩১
নও মুসলিম... তারপর? ৩৪
'সকল ধর্ম সত্য' ৩৯
খেলা... এবং অতঃপর ৫৯
সিয়ান ৬৬
হিজাবকথন ৭৩
স্বপ্ন দেখব বলে দু-চোখ পেতেছি ৮০
ভালোবাসা প্রকাশে সংকোচ নয়, বিলম্বও নয় ৮৬
পাওনাদার ও ধর্মের কথা ৯০
ইসলাম কি লেবুর শরবত খেতে উৎসাহিত করে? ১০২
সংখ্যালঘু নির্যাতন প্রতিরোধে ইসলাম ১১৪
আমি তো সত্যি কথাই বলছি! ১২০
বিপ্রতীপ ১৩১
অ্যারিস্টটলের ঈশ্বর ১৩৭
কাছে আসার গল্প! ১৪৬
বোকা বাক্সের কথা ১৪৯
প্রথম পদক্ষেপ ১৫৩
ঘরে বাইরে ১৫৮
প্রিয় মুক্তমনা ১৬৫

ফিসফিস ১৭১
এপিঠ : ওপিঠ ১৮১
ফুটবলের নিষিদ্ধ লোবান ১৮৫
দুষ্টচক্র ১৮৯
এম্পাটি ইওর কাপ ১৯৭
এই চিঠিটি তোমার জন্য ২০১
বুঝলি না জীবন কারে কয় ২০৫

সম্পাদকের কথা

ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থায় তাদের পার্লামেন্ট দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট। একটিকে বলা হয় নিম্ন কক্ষ বা House of Commons, অন্যটিকে বলা হয় House of Lords বা উচ্চকক্ষ। সাধারণ জ্ঞান বলে যে, উচ্চকক্ষ নিশ্চয়ই অধিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী। একসময় ছিলও তাই। উচ্চকক্ষের অনুমোদন ছাড়া কোনো আইন কার্যকর হতো না। সময়ের সাথে সাথে নিয়ম বদলেছে। রাজতন্ত্রের পাট চুকিয়ে বর্তমানে তাদের নৌকা গণতন্ত্রের ঘাটে। উচ্চকক্ষের সদস্যরা ভোটে নির্বাচিত নন। রাজা-রাণী যুগের ঐতিহ্য ধরে এর সদস্যরা নির্বাচিত হন বংশীয় উত্তরাধিকার সূত্রে, টেকনোক্র্যাট হিসেবে কিংবা রাণীর ইচ্ছায়। তাই তাদের কার্যকর কোনো ক্ষমতা নেই; কেবল উচ্চাঙ্গিক আলাপ-আলোচনার দ্বারা জাতিকে আনন্দ দেওয়া ছাড়া। একসময় তারা যে-কোনো প্রস্তাবিত আইনকে এক বছরের জন্য স্থগিত রাখতে পারত; এখন সে ক্ষমতাটুকুও নেই। অথচ হাউজ অব লর্ডস-এর পেছনে বছরে খরচ হয় বিশাল অঙ্কের অর্থ। ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরের রিপোর্ট অনুযায়ী সে বছর ব্যয় হয়েছে ১৫৩ মিলিয়ন পাউন্ডেরও বেশি। রাজতন্ত্রের ঐতিহ্যস্বরূপ তাদের রয়েছে একটি রয়্যাল ফ্যামিলি এবং একজন রাণী। শাসন ব্যবস্থায় তার কোনো ভূমিকা না থাকলেও প্রত্যেক ব্রিটিশ নাগরিকের করের অর্থ থেকে গড়ে প্রতি বছর ৫৩ পাউন্ড ব্যয় হয় তাকে পোষার জন্য। টেলিগ্রাফের রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে রাণীর খরচ ২ লাখ পাউন্ড বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২.১ মিলিয়ন পাউন্ড।

এবার আসি আমাদের দেশে। টিআইবি-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১১-২০১২ হিসাব মোতাবেক আমাদের জাতীয় সংসদে প্রত্যেক মিনিট কথা বলার জন্য ব্যয় হয় ৭৮ হাজার টাকা। অর্থাৎ প্রতি ঘণ্টায় ৪৬ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। জনগণের অর্থ খরচ করে কতটুকু দরকারি কথা হয় আর কতখানি অদরকারি—সে হিসাব সকলেরই জানা। অথচ এই দেশে দুমুঠো ভাতের জন্য নাড়িছেঁড়া ধন সন্তান বিক্রি করে দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটে; ঘটে নিজ সন্তানকে হত্যার ঘটনাও।

অন্যদিকে আমাদের মুসলিম জাতির ইতিহাস হলো এমন যে, রাষ্ট্রপ্রধান ব্যক্তিগত কথা বলার সময় রাষ্ট্রীয় কাজের জন্য দেওয়া কুপিটি নিভিয়ে কথা বলেন। মাথায় কাপড়ের গাট্টি নিয়ে রাষ্ট্রপ্রধান চলছেন বাজারে—বেতনের টাকায় সংসার চলছে না বলে।

আমাদের জীবনে ভূতের মতো ভর করা বাহুল্যতার সকল দিকের উদাহরণ দেওয়া শুরু করলে একটি সম্পূর্ণ বই হয়ে যাবে। বর্তমান দুনিয়ার হাজারো বাহুল্য ব্যয়ের মাত্র দুটো চিত্র তুলে ধরলাম। মানুষের জীবনে বাহুল্য বিলাসিতা মানুষকে 'আবাস' বা অনর্থক সৃষ্টিতে পরিণত করে। অর্থহীন কাজে জীবনের মূল্যবান সময় ও অর্থ ব্যয় করাটা যখন এমন সমাজ-রাষ্ট্রীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, তখন সে সমাজে অন্যায়-অবিচার, যুলুম-নির্যাতন স্বাভাবিক নিয়ম হয়ে যায়।

আর্থিক বাহুল্যতার দিক থেকে ফিরে এবার একটু আমাদের চৈন্তিক বাহুল্যতার দিকে চোখ বোলাই।

আমরা সাধারণ মানুষেরাও এমনসব অনুষঙ্গকে আজকাল আমাদের চিন্তাভাবনা, আবেগ-অনুযোগের অবিচ্ছেদ্য অংশ বানিয়ে ফেলেছি, যা না থাকলেই বরং আমাদের জীবনটা সত্যিকার অর্থে বেঁচে যেত হয়তো।

ফুটবল নামক কোনো খেলা যদি মানবজাতি কোনোদিন না-ই খেলত, কী ক্ষতি হতো তাতে? অথচ সেটাকে আজ এমন পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে যে, তা আমাদের জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়। যে খেলা মাঠে ছিল কেবল শরীর সুস্থ রাখার জন্য ছোটাছুটি, সেটা আজ ড্রয়িংরুমে ঢুকেছে কেবলই আরাম কেদারায় বসে উপভোগ করা বিনোদনের উপকরণ হয়ে; সাথে যুক্ত হয়েছে নানা বহুজাতিক ধান্দাবাজদের নানা রকম বাণিজ্যিক অনুষঙ্গ। তাই দেখা যায়, নিজ দলের সমর্থনের জন্য লক্ষ-কোটি টাকার কাপড়ের পতাকা ওড়ে যে দেশে, সেই দেশেই লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য যাকাতের কাপড় নিতে গিয়ে পদপিষ্ঠ হয়ে মানুষ মারা যায়।

সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি, দিনের পর দিন আমাদেরকে বোকাবাক্সের সামনে বসিয়ে রেখে যারা আমাদের জীবনের তেরোটা বাজিয়ে দিল; যাদের মতো হতে গিয়ে লক্ষ কিশোরের বই-খাতা শিকেয় উঠল; জাতীয় জীবনের সত্যিকার উন্নতি-অগ্রগতিতে যাদের বিন্দুমাত্র ভূমিকা নেই, সেই ডাংগুলি খেলোয়াড়রাই আমাদের কাছে হিরো বনে গেল!

যে নায়ক-নায়িকাদের মতো হতে গিয়ে আমাদের ছেলেমেয়েগুলো বখে গেল; পাড়ার মাস্তান ছেলেটার হাত ধরে মেয়েটা বেরিয়ে গেল, তাদের মডেলের কোর্তা-কামিজ না পরলে আমাদের ঈদ-উৎসব মাটি হয়ে যায়!

কিন্তু খাবার টেবিলে বসে চিকন চালের ভাতের সাথে ঘিয়ে মাখা আলুভর্তা, টাটকা মাছ আর সুস্বাদু সবজির তরকারি দিয়ে পেটপুরে খাওয়ার সময় কি কখনো ভেবে দেখেছেন, দিনাজপুরের অজ পাড়াগাঁয়ের সেই শুক্কুর আলির কথা; যে রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে শুকিয়ে ধান লাগিয়েছিল খেতে—চিকন ধান। ঠিক আজ যে ভাত আপনি তৃপ্তির সাথে খেয়েছেন, সে চালগুলো তার খেতেই উৎপন্ন হয়েছে। কিংবা সেই আবদুস সবুর মিয়ার কথা, যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আলু চাষ করেছিল? কিংবা সেই হরিপদ জেলের কথা, আপনার আজকের খাওয়া মাছটি ধরতে গিয়ে যাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নদীতে জাল ফেলে বসে থাকতে হয়েছে?

সাহিত্য যেমন একটি জাতির দর্পণ, তেমনি সেই জাতির চিন্তা-চেতনায়ও সাহিত্যের প্রভাব অনেক গভীর। সাদা মনের মানুষ তৈরির জন্য মানুষকে বই পড়ানোর নানা উদ্যোগ দেখা যায় চারদিকে। কিন্তু আয়োজন উদ্যোগের সাথে জাতির চিন্তা-চেতনার দৈন্যতাও যেন পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। কারণ, সাদা মনের মানুষ তৈরির জন্য যে বিশাল সাহিত্য ভান্ডার সৃষ্টি হয়েছে, সে সাহিত্যের তেমন কোনো উদ্দেশ্য নেই। আগাগোড়াই বাহুল্যতায় ভরা। কেবল আনন্দ, কাতুকুতু কিংবা সুড়সুড়ি দেওয়াটাই যেন এর কাজ। এর প্রভাবে জাতিও মেতেছে লক্ষ্য-উদ্দেশ্যহীন এক বাহুল্য জীবনযাত্রায়। এ যাত্রার শেষ গন্তব্য যে নরক, তা ভুলিয়ে রাখার জন্য তাদের হাতে যেসব উপকরণ তুলে দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে উচ্চমার্গীয় হলো উল্লিখিত সাহিত্যসামগ্রী।

কেবল নিজের সময় 'হত্যা' কিংবা বেশি হলে 'কাটিয়ে' দেওয়া। সাহিত্যের এই উদ্দেশ্যহীনতা নিয়ে এর রচয়িতারা বেশ গর্বিতও বটে। সাহিত্যের মধ্যে যারা উদ্দেশ্য খোঁজেন, রবী ঠাকুর তো তাদের সমালোচনা করেই ক্ষান্ত হননি, বেশ রসিয়ে রসিয়ে তাদেরকে বুদ্ধিহীন ও ধীবর শ্রেণির লোক সাব্যস্ত করে ছেড়েছেন। একটু ঘুরে আসি বাংলা সাহিত্যের এই গুরুর একটি রচনার কয়েকটি ছত্র থেকে। 'সাহিত্যের উদ্দেশ্য' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—

'সৃষ্টির উদ্দেশ্য পাওয়া যায় না, নির্মাণের উদ্দেশ্য পাওয়া যায়... সৃষ্টির ন্যায়

নিদর্শনের সন্ধানে

হাসানুজ জামান শ্যামল, মাইক্রো বায়োলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ চাই—মাক্কার মানুষ শোরগোল তুলল।

চল্লিশ—চল্লিশটা বছর ধরে এই আমাদের সাথেই ছিল তার ওঠাবসা। জন্মের পর আমাদের শিশু-বাচ্চাদের মতোই সে বেদুইনদের ঘরে বড় হলো, হাঁটতে শেখার পর এই আমাদেরই মাঠে-প্রান্তরে মেষ চরাল, বয়স আরেকটু বাড়তেই তার চাচার কাফেলায় বাণিজ্য করতে সিরিয়া গেল—ঠিক যেভাবে আমরা যাই। আমাদেরই মেয়ে খাদীজাকে বিয়ে করে সংসারী হলো, আমাদের ঘরেই নিজের মেয়েকে বিয়ে দিল : একদম আমাদের কাছের মানুষ ছিল এই মুহাম্মাদ। এখন সে দাবি করে বসছে, সে নাকি নবি—সেই মহাপুরুষ ইবরাহীমের মতো নবি! বললেই হলো? তা বলবেই যদি, একটু প্রমাণ তো দিতে হয়, নাকি? বেশি কিছু তো চাইছি না আমরা। এই যে, যেদিকে চোখ যায় শুধু ধুলা আর বালু, জায়গাটাকে আচ্ছামতো বৃষ্টি-বন্যায় ভাসিয়ে শস্যশ্যামল করে দিলেই তো হয়! অথবা আমাদের বিখ্যাত বিখ্যাত যত পূর্বপুরুষ গত হয়ে গেছেন, যাদের কেচ্ছাকাহিনি কবিদের মুখে মুখে ফেরে, তাদেরকে জিন্দা করে দেখাক না কেন! তাহলেই তো আর বাপু সন্দেহ থাকে না, আমরাও সবাই ঘাড় কাত করে মেনে নিই—তুমি নবি।[১]

মাক্কার সেই ডাকসাইটে বুদ্ধিজীবী মহল এখন ধুলো; কিন্তু অভিযোগটা কেমন যেন চিরন্তন—দেশে দেশে কালে কালে যেখানেই ধর্মকে যুক্তির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে, সেখানেই এর পুনরুত্থান। আলোকপ্রাপ্তির সময়কার (Age of Enligtenment) দার্শনিকরা ধরলেন এই ব্যাপারটাই—তোমার ধর্ম সত্য? শুনে খুশি হলাম, তা প্রমাণটা কোথায় বাছা? এই আজ পর্যন্ত অ্যাকাডেমিয়া থেকে শুরু করে ব্লগারদের চিন্তাখাতায় ঘুরে ফিরে একই প্রশ্ন—ধর্ম যদি সত্যিই হয়, তবে শক্ত

[১] ১. সূরা আল আন'আম, ৬:১০৯

কোনো প্রমাণ আসছে না কেন? মাঝারি সাইজের একটা মির্‌যাকেল—এই যেমন আকাশ থেকে পটাশ করে জ্বলজ্যান্ত একজন ফেরেশতা নেমে এলেন! এরকম কিছু হলেই তো সবার মনের সব সন্দেহ চুকে যায়, এক ধাক্কায় সব মানুষ মুসলিম। যদি আল্লাহ আসলেই চান আমরা বিশ্বাস করি, তবে এই সহজ রাস্তাটা নিতে সমস্যা কোথায়?

চলুন দেখি, উত্তর বের করা যায় কি না!

তবে দেখুন, প্রশ্নটা যেহেতু করা হচ্ছে আল্লাহর কাছে; কাজেই উত্তর খুঁজতে কিন্তু আমাদের প্রথমে সেই কুরআনের কাছেই যাওয়া উচিত।

কী রকম প্রমাণ?

প্রথমত, অদেখা স্রষ্টায়। যেমনটি বলেছিলাম, আল্লাহ কিন্তু ইসলামের পক্ষে প্রমাণ দিয়েছেন ঠিকই। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাপারটা সেটা হলো, মাক্কাবাসীর কাছে এই প্রমাণগুলোর গ্রহণযোগ্যতাও ছিল।

ইসলামের সত্যতার পক্ষে একদম প্রধান একটা প্রমাণ ছিল কুরআনের অনন্য সাহিত্য—মানুষের পক্ষে যার অনুকরণ অসম্ভব। দাবিটা কিন্তু কুরাইশরা অস্বীকার করেনি একদম। যেমন ওয়ালিদের কথাই ধরুন। ওয়ালিদ ইবন মুগীরাহ ছিলেন যাকে বলে খেতাবপ্রাপ্ত বুদ্ধিজীবী। আরবি ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে তার মতো গভীর জ্ঞান মাক্কায় দ্বিতীয় কারও ছিল না। তো একদিন কুরআন সম্পর্কে ওয়ালিদের বিশেষজ্ঞ মতামত চাওয়া হলো। ওয়ালিদ বলল,[১] 'আমি আর কী কহিব! আল্লাহর শপথ! কাব্য এবং ইহার অসংখ্য শাখাপ্রশাখা সম্পর্কে আমার হইতে তোমরা কেহই অধিক জ্ঞাত নহো। এমনকি জিন সম্প্রদায়ের কবিতাও ইহার মধ্যে পড়ে। কুরআন যাহা বলিতেছে তাহার সহিত উহাদের কাহারোই তুলনা হইবার নহে। আল্লাহর শপথ! ইহার বক্তব্য অপরূপ সুন্দর, জাঁকজমকপূর্ণ—ইহার রচনাশৈলীর অবস্থান আর সকল সাহিত্যরূপ হইতে বহু ঊর্ধ্বে।'

মাক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব আবু জাহল এই বক্তব্য শুনে যারপরনাই বিচলিত। ওয়ালিদের এই কথাবার্তা যদি আমজনতার কানে যায়, আর দেখতে হবে না, বাপ-দাদার ধর্মের দিন শেষ। কাজেই সমাধান হচ্ছে—যে করেই হোক, ওয়ালিদকে দিয়ে

[১] নাটকে ভাব আনার জন্য ওয়ালিদের উত্তর সাধু ভাষায় দিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

কুরআন সম্পর্কে খারাপ কিছু একটা বলাতেই হবে।

বিচক্ষণ ওয়ালিদ ব্যাপার বুঝলেন। বাপ-দাদার ধর্মের মায়া তারও কম নয়। আবু জাহলকে জানালেন—একটু সময় দাও, ভেবে দেখি।

এই 'ভেবে দেখার' সময়টা ছিল মাক্কার মানুষের জন্য ক্রুশাল। ওয়ালিদ কি কুরআনের পক্ষে সাফাই গাইবেন? নাকি কটূক্তি করবেন? করলে কী ধরনের কটূক্তি? আর যাই হোক, মাক্কার পণ্ডিতকুল শিরোমণি, তার কথা তো আর ফেলা যাবে না কিছুতেই। ঠিক এই সময়টাতে ওয়ালিদ ইবনে মুগীরাহর চিন্তামগ্ন চেহারার ওপর কুরআনের ক্যামেরা জুম করে এল:

» 'সে চিন্তা করেছে এবং মনস্থির করেছে, ধ্বংস হোক সে, কীভাবে সে মনস্থির করেছে! আবার ধ্বংস হোক সে, কীভাবে সে মনস্থির করেছে! সে আবার দৃষ্টিপাত করেছে; অতঃপর সে ভ্রুকুঞ্চিত করেছে ও মুখ বিকৃত করেছে, অতঃপর পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে ও অহংকার করেছে।'[১]

চিত্রটা একটু কল্পনা করুন। মাক্কার মানুষের সামনে ওয়ালিদ ইবনে মুগীরাহ চিন্তিতমুখে পায়চারি করে চলেছেন। তার উদ্দেশ্য, তাদেরকে বোঝানো যে এই কুরআন এমন ইম্প্রেসিভ কিছু নয়। এখন হুট করে 'কুরআন ফালতু' বলে বসলে মানুষ নাও মানতে পারে। কাজেই একটু অভিনয় প্রয়োজন। ওয়ালিদের প্রথম চেহারাটা হচ্ছে নিবিষ্ট চিন্তায় ডুবে থাকা মনীষীর, অন্তত প্রত্যক্ষদর্শীদের চোখে। কুরআন অবশ্য জানে তার ভেতরে কী চলছে। চিন্তার ভান করতে করতে মহাসিরিয়াস মুখে অবশেষে ওয়ালিদ তাকালেন, যেন তার মাথায় নতুন কোনো আইডিয়া এসেছে; কিন্তু না, তাকে আরো ভাবতে হবে। যে কারণে এরপর ভ্রুকুঞ্চন আর মুখের বিকৃতি। তো এই facial drama বেশ খানিকক্ষণ চলার পর ওয়ালিদ থামলেন, থেমে এক ধাপ পিছিয়ে এসে বেশ নেতা-নেতা ভাব নিয়ে বললেন,

'...এ তো অনুকরণ করা জাদু ছাড়া আর কিছুই নয়! এ মানুষের বক্তব্য বৈ নয়।'[২]

জাদু। শেষ পর্যন্ত কুরআনের বক্তব্য হয়ে গেল জাদু! কারণ জানেন? কারণ ওয়ালিদের মতো কুরআনোফোবিকরাও বুঝেছিলেন, কুরআনের মধ্যে অতিপ্রাকৃতিক কিছু

[১] সূরা মুদ্দাসসির, ৭৪:১৮-২৩

[২] সূরা মুদ্দাসসির, ৭৪:২৪-২৫

একটা আছে। শুধু ওয়ালিদ একা নয়, সাধারণ মাক্কাবাসীও কুরআনকে হেয়প্রতিপন্ন করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত জাদুর নিচে নামতে পারেনি।

> '...অবিশ্বাসীদের কাছে যখন সত্য আগমন করে তখন তারা বলে, এ তো সুস্পষ্ট জাদু ছাড়া কিছুই নয়![১]

আর সেই গল্প হয়তো অনেকেই জানেন। খোদ আবু জাহল পর্যন্ত রাতবিরেতে চুপিসারে আল্লাহর রাসূলের কামরায় কান ঠেকিয়ে রাখত কুরআন শুনবে বলে। তাই কুরআনের সেই যে চ্যালেঞ্জ—পারলে এর মতো কিছু বানিয়ে দেখাও, তা একটা সূরাও হোক—অপ্রতিদ্বন্দ্বীই থেকে গেল।

কাজেই মাক্কাবাসীর কাছে কিন্তু কুরআনই ছিল যথেষ্ট প্রমাণ। মাক্কাবাসীদের 'প্রমাণ প্রমাণ' রবের উত্তরে কুরআন তাই বলে দিল, আরে বাবা, তোমাদের তো প্রমাণ দেওয়া হয়েই গেছে![২] তোমরা নিজেই তো দেখিয়ে দিলে কুরআন অতিপ্রাকৃতিক, মানুষ তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্যর্থ।

কাজেই মাক্কার মানুষের দাবিটা এরকম ছিল না যে, ইসলাম আদৌ কোনো প্রমাণ দেয়নি; বরং দাবিটা ছিল এরকম যে, প্রমাণ আরো অনেক স্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল। ওদের দাবিগুলো দেখলেই সেটা বোঝা যায়—মরুভূমিকে সবুজ বানিয়ে দাও, পূর্বপুরুষদের জীবন্ত করে দাও, পাহাড়কে সোনা বানিয়ে দাও ইত্যাদি। বলতে পারেন এমন পর্যায়ের প্রমাণ যা সবরকম বিতর্কের ঊর্ধ্বে। ওদের কাছে যে প্রমাণ এসেছে তা এমনিতেই যথেষ্ট স্পষ্ট; তার জন্য তারা জাদু ছাড়া অন্য কোনো ট্যাগই খুঁজে পেল না; কিন্তু না, আরো শক্ত প্রমাণ চাই!

কুরআনে এসব দাবির উত্তর একাধিকভাবে এসেছে। আমরা এই লেখায় একটিমাত্র দিক নিয়ে কথা বলব। একটা ব্যাপার ভুলবেন না: আমাদের আলোচনা মাক্কাবাসী বনাম কুরআনের কনটেক্সটে চলছে ঠিকই; কিন্তু লেখার শুরুতে যেমনটা বলেছিলাম, ধর্মের কাছ থেকে এরকম অবিসংবাদিত স্পষ্ট প্রমাণ লাভের দাবিটা কিন্তু চিরসবুজ। কুরআনের উত্তরগুলো তাই এখনকার কনটেক্সটেও লাগসই।

তবে কুরআনে ঢোকার আগে একটু জ্ঞানতত্ত্ব (epistemology) ঘুরে আসা যাক।

---

[১] সূরা সাবা, ৩৪:৪৩

[২] সূরা আনকাবুত, ২৯:৫০-৫১

নারী নারীবাদ প্যারাডাইম

আসিফ আদনান, মাস্টার্স ইন ইকোনমিকস, ঢাকা ইউনিভার্সিটি

[১]

মানুষ শূন্যতার মাঝে বেড়ে ওঠে না। সমাজ, সংস্কৃতি, সময় ও পরিস্থিতি আমাদের চিন্তা, চেতনা, বিশ্বাসকে শুধু প্রভাবিতই করে না, বরং আমাদের পুরো চিন্তার কাঠামোও ঠিক করে দেয় এধরনের ফ্যাক্টরগুলো। আমরা পৃথিবীকে দেখতে শিখি একটা নির্দিষ্ট লেন্সের ভেতর দিয়ে, একটা নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেলে। আর যেহেতু ছোটবেলা থেকেই এই লেন্সের ভেতর থেকে আমরা পৃথিবীকে দেখছি, তাই কোথায় লেন্সের শেষ হয় আর কোথায় পৃথিবীর শুরু, সেটা আমরা বুঝে উঠতে পারি না।

ব্যাপারটা এভাবে চিন্তা করা যায়— জনবিচ্ছিন্ন কোনো দ্বীপে শৈশব থেকে একসাথে বেড়ে ওঠা একদল কালারব্লাইন্ড মানুষের পৃথিবীর অদ্ভুত সুন্দর নানান রঙের বর্ণালি নিয়ে কোনো ধারণা থাকবে না। কেউ এসে হরেক রকমের উজ্জ্বল রঙের কথা বলা শুরু করলে তারা নির্ঘাত সেই মানুষটাকে পাগল ঠাউরাবে। প্রথম প্রথম তো মানতে চাইবেই না, লম্বা সময় নিয়ে যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে বোঝানোর পরও দ্বিধাদ্বন্দ্ব হয়তো পুরোপুরি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে না। কারণ, তাদের কাছে এটাই বাস্তবতা। এটাই তাদের কাছে অবিসংবাদিত সত্য।

অথবা এমন একজন মানুষের চিন্তা করুন, যে জন্মের পর থেকে ছোট্ট একটা ঘরে বন্দি। ঘরের এক দেয়ালজুড়ে জানালা। এই জানালাই তার বাইরের দুনিয়ার সাথে সংস্পর্শের একমাত্র মাধ্যম। জানালার কাচটা নির্দিষ্ট একটা রংকে বেশি ফুটিয়ে তোলে। ধরা যাক, এই নির্দিষ্ট রংটা হলো হলুদ। ছোট্ট ঘরের এই বন্দি পৃথিবীকে দেখে হলুদ রঙের এক আভায়। গাছ, পাতা, পাখি, ফুল, ঘাস, আকাশ, সাগর, সবকিছুকে সে দেখে হলুদ রঙের ফিল্টারের মধ্য দিয়ে। সে ধরে নেবে, বাইরের দুনিয়াটা হলদেটে। সমস্যাটা তার চোখে না। বায়োলজিক্যালি তার মস্তিষ্কেও কোনো

সমস্যা নেই। সমস্যাটা জানালার কাচে। হলুদ রঙের কাচ আমাদের এই বন্দির চিন্তাকে আটকে ফেলেছে একটা নির্দিষ্ট রঙে। গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর বিখ্যাত 'গুহার গল্প'-এ অনেকটা একই রকমের একটা উদাহরণ দেওয়া আছে।

কথাগুলো বলার কারণ হলো আমাদের বাস্তবতাটা বোঝা। আমাদের চোখেও একটা চশমা দেওয়া থাকে। একটা ফিল্টার, একটা লেন্স থাকে। এর ভেতর দিয়ে আমরা বাস্তবতা দেখি। এই লেন্সের রঙে গড়ে ওঠে আমাদের চিন্তাচেতনা। আমরা নিজেদের চিন্তাচেতনাকে 'আনবায়াসড' ভাবতে পছন্দ করি; কিন্তু কর্তৃত্বশীল সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, দর্শন, মিডিয়া ইত্যাদির কারণে তৈরি হওয়া বায়াস আমাদের চিন্তায় থেকে যায়। এ বায়াস থেকে বের হতে হলে সচেতনভাবে একটা লম্বা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। যদি আমরা এই বায়াস কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা না করি, তা হলে আমরা সবসময় বাস্তবতাকে দেখব ওপরের কালারব্লাইন্ড কিংবা বদ্ধ ঘরের বন্দির মতো। এমনকি আমাদের চোখে যে লেন্স দেওয়া আছে, হয়তো একজীবন কাটিয়ে দেওয়ার পরও সেটা আমরা বুঝে উঠতে পারব না।

আজ আমাদের চোখে সেঁটে থাকা লেন্সটা পশ্চিমা। এই লেন্সের মধ্য দিয়ে আমরা যখন ইসলামকে দেখি, তখন অনেক কিছু মেনে নেওয়া আমাদের জন্য কঠিন হয়ে যায়। ইসলামের অনেক কিছু আমাদের কাছে 'যৌক্তিক', 'আধুনিক' কিংবা 'উপযুক্ত' মনে হয় না। বস্তুত, ইসলামের মধ্যে এমন অনেক কিছু আমরা দেখি, যেগুলোকে মনে হয় ছোটবেলা থেকে মুখস্থ করা ধ্যানধারণাগুলোর সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। এ মনে হওয়াটা স্বাভাবিক। ইসলামের প্যারাডাইম, পশ্চিমা প্যারাডাইমের চেয়ে আলাদা। ব্যাপকভাবে আলাদা। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বাস্তবতা, জ্ঞান এবং নৈতিকতার যে শিক্ষা আমরা পাই, সেটা পশ্চিমের ব্যাখ্যার সাথে মেলে না। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ দুটো অবস্থান সাংঘর্ষিক। এ সংঘাতের সমাধান না করা হলে দুটো বিপরীতধর্মী বিশ্বাস একসাথে ধারণ করতে গিয়ে আমাদের মধ্যে তৈরি হয় জ্ঞানগত সংঘাত। এমন অবস্থায় কেউ ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। কেউ চেষ্টা করে পশ্চিমের সাথে মিলিয়ে ইসলামের নতুন ব্যাখ্যা দিতে। আর যাদের ওপর আল্লাহ্ আযযা ওয়া জাল রহমত করেছেন, তারা পশ্চিমা লেন্সটা খুলে ফেলে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে শেখে আল্লাহর কাছে।

ইসলামের বিভিন্ন বিধান নিয়ে আজ যে আমরা 'খটকায়' থাকি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার কারণ হলো এই দুই প্যারাডাইমের সংঘর্ষ। গোলমালটা লাগে পশ্চিমা

প্যারাডাইমের ভেতর থেকে ইসলামকে বিচার করার চেষ্টা থেকে। কটকটে হলুদরঙা লেন্সের ভেতর দিয়ে নীল সমুদ্রকে খুব একটা সুন্দর লাগার কথা না। চোখের সামনে থেকে এই লেন্স যে সরাতে পারবে না, সমুদ্রের সৌন্দর্য নিয়ে লেখা সব কবিতা, সব কথা সারাজীবন তার কাছে বেখাপ্পা কিংবা ভুল মনে হবে। মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তাতে সমুদ্রের সৌন্দর্য এক ফোঁটা কমবে না। সমুদ্র যে সুন্দর, বদলাবে না এই সত্য।

এটা আশা করে বসে থাকা যাবে না যে, কটকটে হলুদ লেন্সের মধ্য দিয়েই সমুদ্রকে সুন্দর লাগতে হবে। তা না হলে সমুদ্র কুৎসিত।

সমুদ্রকে দেখতে হলে চোখের সামনে থেকে লেন্স সরাতে হবে।

[২]

বর্তমানে যে বিষয়গুলোকে ব্যবহার করে ইসলামকে সবচেয়ে বেশি আক্রমণ করা হয়, তার মধ্যে অন্যতম হলো 'নারীর প্রশ্ন'। নারীর অবস্থান, ভূমিকা, অধিকার, পর্দা, বহুবিবাহ ইত্যাদি নিয়ে আজ নানাভাবে আক্রমণ করা হয় ইসলামকে। আমরা মুসলিরাও এমন অনেক বিষয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগি। মুসলিম নারীকে কেন্দ্র করে ইসলামকে আক্রমণ করার অভ্যাস পশ্চিমের পুরোনো। কলোনিয়াল যুগের ওরিয়েন্টালিস্টরা মুসলিম নারীকে চিত্রিত করেছে হারেমে বন্দি কামুক নর্তকী হিসেবে। ভিক্টোরিয়ান ওরিয়েন্টালিস্টদের কলমে মুসলিম নারী এক রহস্যময় যৌনবস্তু। একই সাথে অতৃপ্ত ও তৃষিত। পশ্চিমা রক্ষাকর্তাকে 'সুখ' দিতে উন্মুখ, উদ্‌গ্রীব। গত শতাব্দীতেও মুসলিমদের আত্মপরিচয়, আত্মমর্যাদাবোধ এবং প্রতিরোধের স্পৃহা ভেঙে দেওয়ার জন্য আলজেরিয়াতে ঔপনিবেশিক ফ্রান্সের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল পর্দা। আর আজ পশ্চিমের কাছে মুসলিম নারী মানে বন্দি, নির্যাতিতা। পর্দা তার দাসত্বের চিহ্ন। এই নারীকে মুক্ত করার জন্য 'পবিত্র যুদ্ধ' চালিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমা রক্ষাকর্তা। নিউইয়র্ক টাইমস আর ওয়াশিংটন পোস্টের মতো পত্রিকাগুলোতে তাই নিয়মিত বিরতিতে আফগানিস্তান কিংবা ইরাকের নারীদের নিয়ে প্রতিবেদন করে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে, 'ওরা কত নির্যাতিত। ওদের রক্ষার জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া কতটা গুরুত্বপূর্ণ।'

এধরনের চিন্তা আমাদের প্রভাবিত করে। দীর্ঘদিন ধরে প্রভাবিত করে আসছে। এধরনের চিন্তাকে আমাদের সমাজে 'ডিফল্ট পজিশান' হিসেবে গ্রহণ করা

হয়েছে অনেক আগেই। পাতায় পাতায় স্পষ্ট কুফরি বক্তব্যের তুবড়ি ছুটিয়ে যাওয়া রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের লেখা আমাদের মুখস্থ করানো হচ্ছে স্কুলে থাকতে। জমিদারবাড়িতে জন্ম নেওয়া আর লুটেরা ব্রিটিশের অধীনে চাকরি করা বাদামি ম্যাজিস্ট্রেট বাবুর বউ হিসেবে জীবন কাটিয়ে দেওয়া এই মহিলাকে উপস্থাপন করা হচ্ছে গ্রামবাংলার নারীদের জন্য অনুসরণীয় হিসেবে। নারীমুক্তির পথিকৃৎ হিসেবে। মুক্তির অর্থ যেন আরও বেশি করে 'পশ্চিমা' হয়ে ওঠা!

এনজিও, মিডিয়া; এমনকি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ক্রমাগত সরাসরি বা ইঙ্গিতে বলা হচ্ছে নারীর ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান 'অমানবিক', 'বর্বর', 'ব্যাকডেইটেড'। পর্দাকে তাঁবু বলা হচ্ছে হাসতে হাসতে। ইসলামের বিধানকে তুচ্ছ করা হচ্ছে—কারণ সেটা বাঙালি সংস্কৃতি নামক কোনো একটা জোড়াতালি দিয়ে চাপিয়ে দেওয়া বিষয়ের সাথে মেলে না। অন্যদিকে পপুলার কালচার (সেটা বাংলা টিভি, গান, ঢালিউড, বলিউড, হলিউড যাই হোক না কেন) নারী ও পুরুষের সম্পর্ক, মেলামেশা, ঘনিষ্ঠতার এমন একটা ছবি তুলে ধরছে, যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। আমরা দেখছি সমাজ, সংস্কৃতি, মিডিয়া এক স্রোতে এগুচ্ছে, আর ইসলাম বলছে সম্পূর্ণ আলাদা কথা। এ সবকিছুর প্রভাব পড়ছে আমাদের চিন্তার ওপর। নারীর প্রশ্নে, আমরা পশ্চিমের কাছ থেকে কলকাতার রুট হয়ে আসা চিন্তার এ কাঠামোটা ধ্রুব সত্য হিসেবে গ্রহণ করে নিচ্ছি। অনেকে বুঝেশুনে, অনেকে নিজের অজান্তে। আর এই কাঠামো ও লেন্স নিয়ে যখন আমরা কুরআন-সুন্নাহ পড়তে যাচ্ছি, তখন মেনে নিতে পারছি না ওয়াহির বক্তব্য। পশ্চিমা লেন্সের ভেতর দিয়ে দেখার পর আল্লাহর কথা আর 'ভালো লাগছে না'।

[৩]

এমন অবস্থায় কয়েক ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। একটা হলো উগ্র 'নারীবাদী' অবস্থান। যারা মোটাদাগে বাংলাদেশের 'শাহবাগী মুক্তমনা' ক্যাম্পের অংশ। এই ক্যাম্পের লোকজন অনবরত ইসলামকে আক্রমণ করে যায়। তাদের মতে সমাধান হলো জীবনের সব বলয় থেকে ইসলামকে সরিয়ে দেওয়া।

দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়াটা সম্ভবত অধিকাংশ বাঙালির অবস্থান। এই বাঙালি ইসলামের বিরোধিতা করে না। ধর্মভীরু মুসলিম বলে নিজের পরিচয় দেয়। কিন্তু নারীর সাথে যুক্ত ইসলামের অধিকাংশ বিধিবিধান সে মানে না। বাঙালি কালচার, সমাজের ধারা,

মানুষ তোমাকে ভালোবাসবেই

শিহাব আহমেদ তুহিন, মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং, কুয়েট

এক.

পশ্চিমা দেশের একটি ভার্সিটি। সেখানে সবাই বেশ খোলামেলা কাপড় পরে। এর মধ্যে হুট করে এক মেয়ে উদয় হলো, যে নিকাব পরে ক্লাসে আসে। তবে এভাবে আসাটা একেবারে সহজে হয় না। বেশ টিটকারি হজম করতে হয়। চলে নানা তির্যক মন্তব্য।

তবে পেছনে পেছনে ক্লাসমেটগুলো ঠিকই মেয়েটার প্রশংসা করতে বাধ্য হয়। এই যুগে উঠতি বয়সের এক মেয়ের বয়ফ্রেন্ড নেই, ড্রিংকস করে না, নাইটক্লাবে যায় না—কীভাবে সম্ভব! এ মেয়ে পৃথিবীর নাকি মঙ্গল গ্রহের! সামনে যত বৈরিতাই দেখাক না কেন, পেছনে পেছনে ঠিকই তার প্রশংসা করতে বাধ্য হতো ওরা। বাধ্য হতো ওকে পছন্দ করতে।

ব্যাপারটা অদ্ভুত হলেও সত্যি। যখন কেউ সত্যিই আল্লাহকে ভয় করে চলে, তার রবকে ভালোবাসে, আল্লাহ তখন মানুষের মনে তার জন্যে ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা ঢেলে দেন। তার বিরোধীদের কথা শুনলে হয়তো সেখানে বাহ্যত ঘৃণার উদ্‌গিরণ দেখা যাবে, তারা তাকে তার ঈমানের কারণে বন্দি করতে চাইবে, হত্যা করতে চাইবে; কিন্তু মনে মনে ঠিকই তারা সে লোকের জন্য শ্রদ্ধা রেখে চলবে। সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর চেয়েও তার কথাকে বেশি বিশ্বাস করবে। ইবনুল কায়্যিম (রহ.) তাই উল্লেখ করেছেন—

> ‘যে আল্লাহকে ভয় করে, মানুষ তাকে ভালোবাসবেই। এমনকি ভালোবাসতে অপছন্দ করলেও তাকে ভালোবাসবে।’[১]

[১] আল-ফাওয়াইদ, ১/৫৪

এ বিষয়ে খুব সুন্দর একটি হাদীস রয়েছে। রাসূল (সা.) বলেছেন—

» 'যখন আল্লাহ তাঁর কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তিনি জিবারাইলকে ডেকে বলেন, আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, তাই তুমিও তাকে ভালোবাসো। তখন জিবারাইলও তাকে ভালোবাসেন। আর জিবরাইল তখন আসমানবাসীদের বলেন, আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, তাই (এখন থেকে) তোমরাও তাকে ভালোবাসবে। ফলে সমগ্র আসমানবাসী সে লোককে ভালোবাসতে শুরু করে। এরপর পৃথিবীবাসীর নিকটে তার গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হয়।'[১]

যে মেয়েটার গল্প দিয়ে শুরু করেছিলাম, সেটি এক শায়খের কাছ থেকে শোনা। গল্পের শেষটা বেশ হতাশার। মেয়েটা ক্লাসমেটদের কাছ থেকে টিটকারি শুনতে শুনতে অসহ্য হয়ে একদিন পর্দা ছাড়াই ওয়েস্টার্ন পোশাকে ভার্সিটিতে চলে গেল। ওর ক্লাসমেটরা তো হতভম্ব। মেয়েটা আশা করেছিল, সবাই ওকে এভাবে দেখে ওর রূপের প্রশংসা করবে। এসব 'নিনজা-মার্কা ড্রেস' ছাড়ার কারণে ওর সাথে ভালোভাবে মিশবে।

তবে একেবারেই অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল। ক্লাসমেটদের বেশ বড় একটা গ্রুপ ওর কাছে গেল। বলল, তুমি কি জানো, সামনে যা-ই বলি না কেন, ভেতরে ভেতরে আমরা তোমাকে অনেক সম্মান করতাম? তোমার সুন্দর আচরণ দেখে মুগ্ধ হতাম? অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিল যে, আমরা সবাই ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম। কারণ, আমরা ভেবেছিলাম ইসলামের কারণেই তুমি এত আলাদা। এত ভালো। কিন্তু এখন সে সিদ্ধান্ত বাদ দিয়েছি। কারণ, যে ধর্ম সামান্য কিছু সময় তোমাকে ভালো রাখতে পারল না, সেটা আমাদের কীভাবে সারাজীবন ভালো রা খবে?

দুই.

ভার্সিটি লাইফের শেষরাতে আমি জুনিয়রদের একটা কথা বলেছিলাম। বলেছিলাম— কখনো তোমাদের দীনের ব্যাপারে ছাড় দেবে না। মানুষ যত সুন্দর করে কথা বলুক আর যত উগ্রভাবেই বলুক। তোমাকে ওরা এসে বলবে, 'চলো একটু ট্যুরে যাই,

[১] সহীহ বুখারি, হাদীস নং, ৩২০৯

নাইট প্রোগ্রামে যাই, ক্লাসপার্টিতে যাই। তুমি মেয়েদের সাথে থাকলা না, সমস্যা কী? আমাদের সাথে থাকবা। আর নামাযের সময় হলে নামায পড়তে চলে যাবা।'

তুমি যদি ওদের কথা শুনে ওসব ফিতনার জায়গায় যাও, ওরা খুশি হবে। কিন্তু মনে মনে ভাববে, ওর মধ্যে ভেজাল আছে। না হলে হুজুর হয়ে এসব জায়গায় থাকে কীভাবে?

আর যদি তুমি ওদের না করে দাও, ওরা হয়তো খুব মন খারাপের ভাব দেখিয়ে চলে যাবে। কিন্তু অন্তর থেকে তোমাকে শ্রদ্ধা করবে। যারা চিন্তা করতে জানে, তারা তোমার এমন আচরণ নিয়ে ভাববে। কে জানে! একদিন নিজেই হয়তো এসব ভাবতে ভাবতে সে হিদায়াত পেয়ে যাবে।

তারা ভালো আচরণ করুক কিংবা খারাপ; বন্ধু হোক বা শত্রু, তারা আমাদের গভীরভাবে দেখছে। যদি নিজের জন্যে ভালো থাকতে ইচ্ছে না করে, আল্লাহর দীনের জন্য অন্তত আমরা ভালো থাকার চেষ্টা করতে পারি।

ওরা যা-ই বলুক, কখনো নিজেদের ইনফিরিওর ভাববেন না। আপনার কাছে আল্লাহর দীন রয়েছে। ভার্সিটিতে যেসব মাঠ কাঁপানো, অডিটোরিয়াম ঝাঁকানো, সিজি কোপানো তথাকথিত লিজেন্ড আছে, আপনি তাদের চেয়ে অনেক বেশি লিজেন্ড, অনেক বেশি সম্মানিত—যদি আপনার মধ্যে তাকওয়া থাকে।

ওরা আপনাকে নিয়ে উপহাস করে। জঙ্গি, ক্ষ্যাত, কাঠমোল্লা—বলে। কিন্তু হারামের সাথে রাতদিন কাটিয়ে যখন হাঁপিয়ে ওঠে, তখন ঠিকই ওদের ইচ্ছে করে ভালো হয়ে যেতে। আপনার মতো হুজুর হয়ে যেতে। জেনে রাখুন, যদি আল্লাহকে ভয় করে চলেন, তবে তিনি ওদের অন্তরে আপনার জন্য শ্রদ্ধার বীজ বুনে দেবেন।

সে বীজ যাতে ইসলাম নামক মহিরুহে পরিণত হয়, সেটার জন্য হলেও আপনাকে ভালো থাকতে হবে।

‘সকল ধর্ম সত্য’

জুবায়ের হোসাইন, EEE, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

১.

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। হিন্দুধর্ম শিক্ষা বিষয়ে স্কুলপাঠ্য একটা বই নেড়েচেড়ে দেখছিলাম। সম্ভবত চতুর্থ শ্রেণির বই ছিল সেটা। তাতে একটা পরিচ্ছেদ দেখলাম নাম দেওয়া হয়েছে ‘সকল ধর্ম সত্য’।

কৌতূহলবশত পড়ে দেখলাম কী লেখা। দেখলাম লিখেছে—সৃষ্টিকর্তাকে হিন্দুরা ঈশ্বর বলে, মুসলমানরা আল্লাহ্ বলে, খ্রিষ্টানরা God বলে, আসলে তিনি একজনই। কাজেই সব ধর্মই একজনের উপাসনাই করে, শুধু ভিন্ন ভিন্ন পথে। সুতরাং আসলে সব ধর্মই ঠিক, কোনোটাকেই ভুল বলা উচিত না।

আমি বহু অমুসলিমের সাথে কথা বলে দেখেছি, তারা প্রায় সবাই এমন ধারণাই পোষণ করে। সেটা এরকম যে, সৃষ্টিকর্তা আসলে একজনই, তাঁকে একেকজন একেক নামে ডাকে। একেকজন একেকভাবে উপাসনা করে। কিন্তু সবার লক্ষ্য একটাই। সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য লাভ। কাজেই সবগুলোই ঠিক; কারণ পথ ভিন্ন হলেও লক্ষ্য তো একটাই। যেমন: আমি ঢাকা থেকে কুমিল্লা যাব। অনেকগুলো রাস্তা আছে যাওয়ার। কিন্তু সব রাস্তাই কুমিল্লা গিয়ে মিলেছে। কাজেই আমি যে পথই নিই না কেন লক্ষ্যে ঠিকই পৌঁছব। একইরকমভাবে সৃষ্টিকর্তাকে আমি যেভাবেই উপাসনা করি না কেন তাঁকে আমি পাব, যদি আমার উদ্দেশ্য সৎ থাকে।

একজন মানুষ যদি গভীরভাবে চিন্তা না করে, তার কাছে হয়তো কথাগুলো যুক্তিযুক্ত মনে হবে। তাই এমনকি অনেক মুসলিমও শুনেছি এ কথা বলে যে, অমুসলিমরাও জান্নাতে যেতে পারে, যদি সে পাপ না করে। কারণ, সেও তো সৃষ্টিকর্তারই উপাসনা করছে, শুধু পথটা ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ, মাদার তেরেসা বা নেলসন ম্যান্ডেলার মতো ভালো মানুষেরা; যারা আজীবন মানবসেবা করে গেলেন, কেবল অমুসলিম

হবার কারণেই কি তারা জাহান্নামে যাবেন? এটা কি অবিচার নয়?

লালন-বাউল আর নানা রকম মারফতি গান-কবিতা আছে, সেখানেও সব ধর্মের Unity'র কথা বলা হয়। ধর্মে-ধর্মে হানাহানির মূলে নাকি এটাকে মানতে না পারার মানসিকতা। মানুষ যখন নিজের ধর্মকেই কেবল সঠিক মানে, তখনই অনর্থ সৃষ্টি হয়।

সেদিন আমার এক অমুসলিম বন্ধু বলল, 'মানুষ যে ধর্মই পালন করুক, সে যদি সেটা ঠিকভাবে পালন করতে পারে, তাহলে কখনো পথ হারাবে না।' কথা তো শুনতে সত্যিই মনে হয়। সব ধর্মই তো ভালো কথা বলে। কাজেই কেউ যদি 'ধার্মিক' হয়, যে ধর্মেরই হোক, সে অবশ্যই ভালো মানুষ। তার দ্বারা খারাপ কাজ হবে না, পাপ হবে না। অন্যায় কাজকে কোনো ধর্মই উৎসাহিত করে না। সুতরাং সবাই নিজ নিজ ধর্ম ঠিকভাবে মেনে চললেই পৃথিবীটা সুন্দর ও শান্তিময় হতো। হানাহানি, মারামারি থাকত না।

২.

এতক্ষণ আমি যা আলোচনা করলাম, তা হলো অমুসলিমদের একটা বড় অংশের ধারণা এবং যুক্তি। এখন আমরা দেখব ইসলাম এ ব্যাপারে কী বলে। সূরা আলে ইমরানের ৮৫ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন—

> 'যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।'

তার মানে এত যুক্তি, এত মানবতত্ত্ব, এত সম্প্রীতির বাণী ইসলাম এক ফুঁৎকারে উড়িয়ে দিচ্ছে! আর বলছে, ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম গ্রহণ করা হবে না, কস্মিনকালেও না।

ইসলাম কেন এত সাম্প্রদায়িক হচ্ছে? অন্যান্য ধর্মকে এক কথায় 'বাতিল' কেন বলছে? আসুন, কারণ অনুসন্ধান করি।

সব ধর্মের একত্রীকরণ মতাদর্শের অনুসারীরা সাধারণত যে মতগুলো পোষণ করে সেগুলো এমন—

ক) যেহেতু ঈশ্বর একজনই; কাজেই যে যেভাবে পারে তাঁর উপাসনা করলেই

তাঁকে পাওয়া যাবে। যেমন: সৃষ্টিকে একটি বিন্দু এবং ঈশ্বরকে আরেকটি বিন্দু ধরলে বলা যায়, দুটি বিন্দুর সংযোজক অসংখ্য রেখা থাকা সম্ভব। সে প্রতিটি রেখাই একেকটি ধর্ম, যার সবগুলো ঈশ্বরের নৈকট্য লাভে সহায়ক।

খ) বিশ্বজগতের সবকিছু ঈশ্বরেরই সৃষ্টি। তিনিই বিভিন্ন ধর্ম সৃষ্টি করেছেন, বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য। যেহেতু সব ধর্ম তাঁরই সৃষ্টি, অতএব কোনোটাকেই অবজ্ঞা করা সমীচীন নয়।

গ) যেহেতু প্রতিটি ধর্মই মানুষের কল্যাণের কথা বলে, ন্যায়ের কথা বলে, তাই প্রত্যেক ধর্মের মানুষ নিজের ধর্ম পুরোপুরি পালন করলে সে সার্থক মানুষ, তার প্রতিদান জান্নাত।

এবার আসুন, আমরা ইসলামের আলোকে ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা করি।

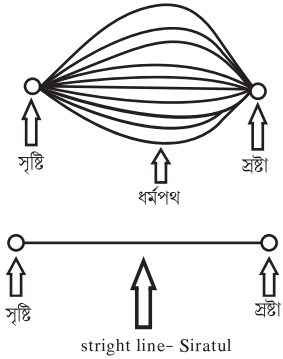

stright line- Siratul Mustakim

প্রথমত, সৃষ্টিকে একটি বিন্দু এবং ঈশ্বরকে আরেকটি বিন্দু ধরলে বলা যায়, দুটি বিন্দুর সংযোজক অসংখ্য রেখা থাকা সম্ভব।

হ্যাঁ। কথা সত্য। অসংখ্য রেখা থাকা সম্ভব। কিন্তু এটা সত্য যে, দুইটি বিন্দুর মধ্যে যে অসংখ্য রেখা থাকা সম্ভব, তার মধ্যে একটি বাদে সবই বক্ররেখা (Curve). কেননা, জ্যামিতি সম্পর্কে যার সামান্য ধারণা আছে, তিনি জানেন দুইটি বিন্দুর মধ্যে একটি এবং কেবল একটি সরলরেখাই (Straight line) থাকা সম্ভব। বাকি সব বক্র।